কিছু কৈফিয়ৎ এবং কৃতজ্ঞতা

ভূমিকার পর...

সেই ষোলশ' শতাব্দীতে কোপার্নিকাস যে বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন তারই শেষ দৃশ্যপটের মঞ্চায়ন দেখছে যেন আমাদের এই প্রজন্ম। কোপার্নিকাস থেকে শুরু করে কেপলার, গ্যালিলিও এবং নিউটনের মত বিজ্ঞানীদের কয়েক শতাব্দীর কাজ আমাদের পৃথিবীকে ফিরিয়ে দিয়েছিল অতিপ্রাকৃত শক্তির হাত থেকে প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার পরিমন্ডলে। মানব সভ্যতার সেই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা প্রথমবারের মত ভাবতে শিখলাম যে, পৃথিবীসহ এই বিশাল মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করার জন্য বাইরের কোন কল্পিত শক্তির প্রয়োজন নেই - প্রাকৃতিক নিয়মগুলোর সাহায্যেই আজকে মহাবিশ্বের উৎপত্তি, বিস্তৃতি, ভুত ভবিষ্যতের ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব, আর সেই ব্যাখ্যাগুলো মানুষের জ্ঞানের পরিধির বাইরে নয়। কিন্তু মানব সভ্যতার এই চেতনামুক্তি জড়জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল প্রথম কয়েক শতাব্দী, জীবজগৎ তখনও রয়ে গিয়েছিল প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার উর্দ্ধে। পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র থেকে ঠেলে বের করে দিলেও মানুষ কিন্তু তখনও দিব্যি নিজেকে বসিয়ে রেখেছিল সমগ্র প্রাণ জগতের কেন্দ্রবিন্দুতে। ১৮৫৯ সালে ডারউইনই প্রথম বললেন, এই পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতির উৎপত্তি এবং প্রাণের বিকাশ ও বিস্তৃতিও প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে নয়, মানুষসহ সব জীবও এই প্রকৃতির অংশ। আমরা যতই নিজেদেরকে তথাকথিত 'সৃষ্টি'র কেন্দ্রস্থলে বসিয়ে স্বান্তনা পাওয়ার চেষ্টা করি না কেন, মানুষ আসলে অন্যান্য জীবের মতই বিবর্তনের অমসৃন আর বন্ধুর পথেরই সহযাত্রী।

বিবর্তনবাদ বলছে পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতিগুলো আলাদা আলাদাভাবে তৈরি হয়নি। আমাদের এই পৃথিবীর বয়স দীর্ঘ সাড়ে চারশ কোটি বছর, সেখানে প্রাণের স্ফুরণ ঘটার পরিবেশ তৈরি হতে হতে আরও প্রায় একশ কোটি বছর পার হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর এই অফুরন্ত প্রাণের মেলায় আমরা যে হাজার হাজার প্রজাতির আনাগোনা দেখি তারা সবাই সেই আদি সরল প্রাণ থেকে বিবর্তিত হতে হতে এখানে এসে পৌঁছেছে। অসংখ্য প্রজাতির উৎপত্তি ঘটেছে, টিকে থাকতে না পেরে তাদের অনেকেই আবার বিলুপ্ত হয়ে গেছে। খুব সহজ একটা তত্ত্ব, কিন্তু কি অপরিসীম প্রভাব তার! ডারউইন তার তত্ত্বটি দেওয়ার পর প্রায় দেড়শ বছর পার হয়ে গেছে, বিজ্ঞান এগিয়ে গেছে অভুতপূর্ব গতিতে। আর যতই নতুন নতুন আবিষ্কার হয়েছে ততই নতুন করে প্রমাণিত হয়েছে বিবর্তনবাদের যথার্থতা। ফসিলবিদ্যা থেকে শুরু করে আণবিক জীববিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, এবং জেনেটিক্স, জিনোমিক্সের মত বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক শাখাগুলো থেকে পাওয়া সাক্ষ্যগুলো বিবর্তনবাদকে আজ অত্যন্ত শক্ত খুঁটির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আর তাই, গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই বিজ্ঞানীরা এই সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিবর্তনবাদকে জীববিদ্যার সব শাখার ভিত্তিমুল হিসেবে গন্য করে আসছেন। কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বের মতই এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

বিবর্তনবাদ তো আসলে শুধুই একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই নয়, এটা আমাদের চিরায়ত চিন্তাভাবনা, দর্শন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনকেও প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। ঘুণ ধরা পুরনো সব মুল্যবোধে তীব্রভাবে আঘাত হেনেছে সে, পুরনো ধ্যানধারণাকে ভেংগে চুরমার করে দিয়েছে! পৃথিবীতে যে গুটিকয়েক তত্ত্ব মানব সভ্যতার ভিত ধরে নাড়া দিয়েছে তার মধ্যে এটি একটি। কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব প্রচার করার জন্য যদি ব্রুনোকে পুড়ে মরতে হয়, গ্যালিলিওর মত বিজ্ঞানীকে চার্চ নামক নিপীড়ক প্রতিষ্ঠানটির কাছে হাঁটু ভেঙে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হয়, তাহলে

বিবর্তনবাদের মত তত্ত্বকে আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে কি প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হবে তা তো বোঝা দুঃসাধ্য নয়। তাই আজ দেড়শ' বছর পরেও আমরা এই প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কোন অন্ত দেখি না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জনমানুষের মধ্যে বিবর্তনবাদ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে গৃহীত হয়ে গেলেও আমেরিকার মত উন্নত দেশটিতে কিন্তু এ নিয়ে বিরোধিতার কোন সীমা পরিসীমা নেই। আমেরিকা যে আজকের দুনিয়ার অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় অনেক বেশী রক্ষণশীল এটা আর কোন নতুন খবর নয়, তবে বিবর্তনের মত একটা সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে এখানকার প্রভাবশালী ধর্মীয় রক্ষণশীল গোষ্ঠীগুলোর হৈ চৈ এর নমুনা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। আজকে আমেরিকার এই অংশটি ক্ষমতাবান রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলগুলোর মদদপুষ্ট হয়ে এতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে তারা এখন স্কুলের পাঠ্যসুচী থেকে বিবর্তন পড়ানো বন্ধ করার দাবী তুলছেন, বিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণার জন্য অর্থবরাদ্দ পর্যন্ত কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। শুধু তো তাই নয়, বিবর্তনের পাশাপাশি ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন (আইডি) নামে নতুন এক চাকচিক্যময় মোড়কে পোড়া সেই প্রাচীণ সৃষ্টতত্ত্বকে স্কুল কলেজের বিজ্ঞান পাঠ্যসুচীর অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছেন তারা।

আমেরিকাসহ পাশ্চাত্যের দেশগুলো এখন জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বইতে সয়লাব হয়ে গেলেও কিছুদিন আগেও কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম ছিল না। বিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র গবেষণা এবং গবেষণামুলক লেখা বা পাঠ্য বই লেখাতেই ব্যস্ত থাকতেন, সহজ ভাষায় সাধারণ পাঠকের জন্য বই লেখাকে একটু যেন হেয় করেই দেখা হত। বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের মধ্যে দীর্ঘ বৈরীতা এবং সাধারণ জনগণ থেকে নিজেদেরকে আলাদা করে রাখার মনোবৃত্তি তো ছিলই, তার সাথে সাথে বোধ হয় সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের ক্ষমতাটাকেও একটু খাটো করে দেখেছিলেন তাঁরা। মনে করা হত যে, বিজ্ঞান যে গতিতে এগুচ্ছে তাতে করে এই রক্ষণশীল ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের অবৈজ্ঞানিক দাবীগুলো আর ধোপে টিকবে না, নিজে নিজেই চুপ করে যাবেন তারা। ওহাইয়ো স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ টিম বেড়া আশির দশকে তার 'Evolution and Myth of creationism' বইতে লিখেছিলেন যে, বিজ্ঞানীরা এতকাল এই রক্ষণশীল বিজ্ঞান বিরোধীদের শক্তি এবং আগ্রাসনের মাত্রাকে অবহেলা করে ভুল করেছেন। নিজেদেরকে গবেষণাগারে রুদ্ধ করে রেখে একদিকে যেমন সাধারণ জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তেমনিভাবেই পরোক্ষভাবে এই বিজ্ঞানবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল অংশটিকে ডালপালা বিস্তার করে ফুলে ফেঁপে উঠতে সহায়তা করেছেন। তাই আজকে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা অনেকটা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কারণেই 'একলা চলো' নীতি পরিবর্তন করেছেন। তাঁরা এখন সাধারণ পাঠকের জন্য সহজ ভাষায় জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই প্রকাশ করছেন, পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখছেন, সভা সমতিতে বক্তব্য রাখছেন, টেলিভিশন, রেডিও, ম্যাগজিনে বিতর্কে অবতীর্ণ হচ্ছেন, আইডি প্রবক্তাদের বিবর্তন-বিরোধী মহলের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে নেমেছেন, এমনকি কোর্টে গিয়ে আইডি প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে জনগণের করা মামলায় সাক্ষ্যও দিচ্ছেন। আইডির বিরুদ্ধে আমেরিকার বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং প্রগতিশীল জনগণের সংগ্রামের এই ইতিহাস নিয়ে বাংলায় বোধ হয় এখনও তেমন বিস্তারিত কোন লেখালিখি হয়নি। এই বইটিতে বিবর্তনের মুল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার সাথে সাথে এই ক্ষমতাশালী আইডি প্রবক্তাদের উত্থান এবং বিস্তৃতির ইতিহাস নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে, এবং বিবর্তনবাদের আলোকে তাদের দেওয়া 'যুক্তি'গুলোর অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে।

আর ওদিকে আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বিবর্তনবাদের মত বিষয়গুলোকে তো সযত্নে এড়িয়েই যাওয়া হয়। সমকাল পত্রিকার এক পরিসংখ্যানে পড়েছিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যা বিভাগের ছাত্র এবং শিক্ষকদের বেশীরভাগই বিবর্তনবাদকে ভুল বলে মনে করেন! স্কুল-কলেজের জীববিদ্যার পাঠ্য বইগুলোতে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বটাকে এমনই দায়সাড়াভাবে পড়ানো হয় যে এ

থেকে ছাত্রছাত্রীরা কিছু বুঝতে পারে কিনা তা নিয়েই সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। তাই সাধারণ জনগণের মধ্যে এ নিয়ে বিরোধিতা এবং ভুল ধারণার কোন অন্ত নেই বললেই চলে। এর পিছনে আরেকটি কারণের কথা বোধ হয় না বললেই নয়; বিচ্ছিন্নভাবে বেশ কিছু ভালো বিজ্ঞানের বই বের হলেও বাংলায় এখনও সেভাবে সহজবোধ্য জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই লেখার ধারাটি শুরু হয়নি। বিবর্তনের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা, জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শনকে প্রভাবিত করতে পারে, তা কি আমাদের শুধু পাঠ্য বই পড়েই জানার কথা? যারা বিবর্তনবাদ নিয়ে লেখাপড়া, গবেষণা বা কাজ করেন তারা ছাড়া অন্যরা তাহলে এ সম্পর্কে কিভাবে জানতে পারবেন? বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া আর বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে পরীক্ষা পাশ করা তো আর এক কথা নয়! গত কয়েক দশকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর কথা জানতে হলে ইংরেজী বই পড়া ছাড়া আমাদের সামনে আর কোন উপায়ই বা খোলা থাকে? কিন্তু ধরুন যারা ইংরেজি বই পড়তে ঠিক অভ্যস্ত নন, কিংবা বিজ্ঞানের ছাত্র নন তাদের জন্য এ ধরণের বিষয়গুলো জানার পথটা একরকম বন্ধই বলতে হবে।

অনুসন্ধিৎসু সকল পাঠকের কথা মাথায় রেখে বিবর্তন তত্ত্বের উপর আধুনিক আবিষ্কারগুলোর কথা লিখেছি, নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো দেওয়ার চেষ্টা করেছি, আবার একই সাথে চেষ্টা করেছি খুব সহজ ভাষায় তা ব্যাখ্যা করতে। তবে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলোতে যেন কোন ভুল না থাকে তার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হয়েছে। ইন্টারনেটের বহুল বিস্তৃতির কারণে সুবিধা এবং অসুবিধা দু'টোই প্রবলতর হয়েছে। একদিকে যেমন সব তথ্য সহজেই হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে ঠিক তেমনই ভুরিভুরি ভুলভাল অবৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বলিত সাইটও গজিয়ে উঠেছে। আর সেই সাথে বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল এবং অন্ধ সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের উদ্দেশ্যপ্রনোদিত মিথ্যাচারের তো কোন শেষ নেই। তাই ইন্টারনেট সাইটগুলো যথাসম্ভব কম ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি, শুধু সেই সাইটগুলো থেকেই উদ্ধৃতি দিয়েছি যেগুলো বৈজ্ঞানিকমহলে বহুলভাবে স্বীকৃত। মুলত রিচার্ড ডকিন্স, মার্ক রিডলি, ডগলাস ফুটুইমা, কেন মিলার, স্টিফেন জে গুলড, ক্রিস স্ট্রিঙ্গার, পিটার অ্যান্ড্রুজের মত আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত ও স্বীকৃত বিজ্ঞানীদের বই এবং প্রকাশিত জার্নাল থেকে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো নেওয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান (প্রাক্তন) এবং বিবর্তনবিদ্যার স্বীকৃত ও স্বনামধন্য শিক্ষক ড. ম. আখতারুজ্জামান অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে বইটি সম্পাদনা করে দিয়েছেন। তিনি আনুসঙ্গিক ভুল ত্রুটিগুলো সংশোধন দিয়েছেন এবং মুল্যবান মতামত দিয়ে লেখাটাকে আরও সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন এবং পরিশেষে বইটির জন্য একটি চমৎকার ভূমিকাও লিখে দিয়েছেন, তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

ছোটবেলা থেকেই বাংলায় জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই এর অভাব অনুভব করে আসলেও নিজেই কখনো বিবর্তনের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বই লিখে ফেলবো তা কোনদিন ভাবিনি। অনেকের অনুপ্রেরণা এবং সহযোগীতার ফসল এই বইটা। মুক্তমনা (www.mukto-mona.com) ওয়েব সাইটে বাংলা এবং ইংরেজিতে বিবর্তন নিয়ে কিছু লেখালিখি শুরু করার পরপরই সুদুর সিলেট থেকে অনন্ত বিজয় অনুরোধ করতে শুরু করেন যাতে এ নিয়ে বাংলায় আমি একটি বই লিখি। সরাসরি বিজ্ঞানের ছাত্র নন তিনি, কিন্তু বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলো জানার আগ্রহ অপরিসীম। পরবর্তীতে অনন্তসহ আবুল কালাম, অভিজিৎ ও হাসান মাহমুদের দেওয়া অনুপ্রেরণায় বইটা লেখা শুরু করি। তারা নিয়মিতভাবে প্রত্যকটি অধ্যায় পড়েছেন, দোষত্রুটি ধরে দিয়েছেন, মুল্যবান মতামত দিয়ে লেখাটার মান উন্নয়নে সহায়তা হয়েছে। ওনাদের আগ্রহ, সহযোগিতা এবং অনুপ্রেরণাকে স্মরণ করে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ড. বিপ্লব পাল বইটার পর্যালোচনা লিখে এবং বিভিন্ন বিষয়ে মতামত দিয়ে কৃতজ্ঞতা বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমার মা, জাকিয়া আহমেদ, অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে প্রত্যকটা অধ্যায়

পড়েছেন। তিনি পেশায় ওকালতি করেন, বিজ্ঞান নিয়ে তেমন কোন আগ্রহ ছিল বলে কোনদিনও মনে হয়নি, কিন্তু এই লেখাগুলো যতই পড়তে থাকলেন ততই যেন তার আগ্রহ বাড়তে থাকলো। আমার বারবারই মনে হয়েছে যে, আমার মার মত দু'একজন সাধারণ পাঠকও বইটা পড়ে যদি আগ্রহ এবং আনন্দ পান তাহলেই আমার এই প্রচেষ্টাটুকু সার্থক হবে। সাথী এবং বন্ধু অভিজিৎ রায়ের কথা বোধ হয় আলাদাভাবে উল্লেখ না করলেই নয়। লেখাটার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিরিবিচ্ছিন্নভাবে পুরো সময়টা ধরেই তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। শেষ পর্যায়ে এসে সময়াভাবে যখন বইটা শেষ করতে পারছিলাম না তখন ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন অধ্যায়টির প্রায় অর্ধেকটা লিখে দিয়েছেন, এমনকি বইয়ের মাঝখানের রঙীন প্লেটগুলো সাজানোর কাজটিরও বেশীরভাগই তারই করা। অভিজিতের সাহায্য ছাড়া মনে হয় না এই বইটা কখনই দিলের আলো দেখতে পেত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিষয়ের অধ্যাপক ডঃ অজয় রায় সাপ্তাহিক বিচিত্রায় লেখাটা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা এবং সম্পাদনা করে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। আসিফকে ধন্যবাদ সাইন্স ওয়ার্ল্ডে লেখাটির বিভিন্ন অংশ প্রকাশের জন্য। এছাড়াও ভোরের কাগজ এবং সমকালসহ বিভিন্ন দৈনিকেও বইটির বিভিন্ন অংশ প্রকাশিত হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শফি আহমেদ লেখাটার প্রথম অংশ পড়ে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে অবসর প্রকাশনীর প্রকাশক আলমগীর রহমানের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ। ভুমিকাটা যখন লিখছি তখন বইটার প্রথম প্রুফ রিডিং চলছে, আলমগীর রহমান যেভাবে বানান থেকে শুরু করে সব খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে নজর দিচ্ছেন তার জন্য তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে হয়। অবসর প্রকাশনীর জাকির আহমেদকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি কম্পোজিং এবং ফন্টের সমস্যাসহ বিভিন্ন টেকনিকাল সমস্যাগুলো সুচারুভাবে দ্রুত সমাধান করে দেওয়ার জন্য। মুক্তমনা ওয়েবসাইটে লেখাটির ধারাবাহিক প্রকাশনার সময় বহু পাঠক ফোরামে এবং ব্যক্তিগতভাবে ই-মেইল করে তাদের মতামত জানিয়েছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

পরিভাষাগত সমস্যা নিয়ে হাবুডুবু খেয়েছি পুরো সময়টা ধরে। আন্তর্জাতিকভাবে কিছু কিছু প্রচলিত শব্দ যেমন gene বা mutation কি ইংরেজিতেই রাখা উচিত নাকি বাংলা পরিভাষায় (যথাক্রমে বংশগতির একক এবং পরিব্যক্তি) লেখা উচিত তা নিয়ে দোটানায় থেকেছি। শেষ পর্যন্ত এ ধরণের কিছু শব্দের বাংলা অনুবাদ ব্যবহার না করে বহুলভাবে প্রচলিত ইংরেজি শব্দগুলোকেই বাংলায় লিখেছি। ভাষা তার গতিতেই চলে, তাকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না; যেমন ধরুন, বাংলায় শেষ পর্যন্ত 'টেলিফোন' কথাটা টিকে থাকবে নাকি 'দুরালাপনীর' মত প্রতিশব্দ ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠবে তা সময়ের সাথে সাথেই নির্ধারিত হয়েছে। আশা করি বাংলায় যত বেশী করে জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই বের হবে ততই পরিভাষাগত সমস্যাগুলোরও সমাধান হবে। বেশ কিছু জায়গায় এখনও ইংরেজি উদ্ধৃতি রয়ে গেছে যা সময়াভাবে অনুবাদ করতে পারিনি। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার পরেও বইটিতে যদি কোন তথ্যগত বা অন্য কোন দোষত্রুটি রয়ে যায় তার দায়িত্ব সমস্তটাই আমার। পাঠকেরা যদি এ বিষয়ে তাদের মতামত জানান, বা বইটা সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে তাদের মতামত ই-মেইল (bonna_ga@yahoo.com) করে জানিয়ে দেন তাহলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

বন্যা আহমেদ
ডিসেম্বর, ২০০৬।

প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য